প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য
মুসলিম কবিদের কাব্যকৃতির পরিপ্রেক্ষিত ও প্রবণতা

সাইফুল্লা

ইতিহাসের ঠিক কোন অধ্যায়ে বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তা নিয়ে যে মতপার্থক্য আছে তার জালে না জড়িয়ে সহজ করে বলা যায়, খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ বা তারও আগে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয় প্রভৃতি জাতি-সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের সূত্রধরে বাঙালি জাতিসত্তার অঙ্কুরোদগম হয়। অতঃপর সময়ের অভিঘাতে তার ক্রমবিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতিসত্তার এই যে উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ তার সূচনায় ইসলামি সংস্কৃতির তেমন কোনো অভিঘাত ছিল না। ভারতে ইসলামের আগমন ঘটেছিল সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধুপ্রদেশে। অতঃপর ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটে। বাংলায় মুসলমানরা প্রথম পা রাখে অষ্টম শতাব্দীতে, আরব বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার সূত্র ধরে। চীন, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যযাত্রার মাধ্যম হিসাবে আরব বণিকরা চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করতো। বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমে আত্মিক সম্পর্কের রূপ নেয়। একটা সময় চট্টগ্রামের স্থানীয় জনজীবনে ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাব পরিস্ফুট হয়। সম্পর্কের গভীরতা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, স্থানীয় জনগণের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। উল্লেখ্য সমকালে দক্ষিণ ভারতীয় রাজা চেরুমল বা পেরুমুল ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন ও হজ্ব করেছিলেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সঙ্গে ইসলামি সংস্কৃতির এই যে সংযোগ তখনও পর্যন্ত তা নিছক স্থানীয় বিষয় ছিল। বৃহৎবঙ্গের সঙ্গে এর তেমন কোনো যোগসূত্র তৈরি হয়নি। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় তুর্কি অধিপতি ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ অভিযান ও গৌড় বিজয়ের প্রেক্ষিতে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের পশ্চাদপসরণের মাত্র একশো বছরের মধ্যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিকাংশ স্থানে তুর্কি আধিপত্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক আধিপত্যের কার্যকারণ পরম্পরায় তুর্কিদের অধিকৃত অঞ্চলে ক্রমশ মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পির ফকির দরবেশ তথা সুফি সম্প্রদায় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। রাজশক্তির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পির ফকিররা যাতায়াত শুরু করেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সব প্রদেশে। সেখানে তখন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। স্থানীয় সমাজ দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল—উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে দুটি সমাজের মধ্যে ব্যবধান

দাঁড়িয়ে গেছিল শত সহস্র যোজনের। নিম্নশ্রেণির কোনোরকম রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, তাদের সামাজিক অধিকারকে যথাসম্ভব দুই পায়ে মাড়িয়ে চলতো উচ্চশ্রেণি। রাজশক্তির আশ্রয় পুষ্ট উচ্চশ্রেণির ভয়াবহ অত্যাচারে প্রতিদিন, প্রতিমূহূর্তে ধ্বস্ত হচ্ছিল সাধারণ মানুষ। নিম্নশ্রেণি বিভক্ত ছিল দুটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ে—হিন্দু ও বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ।

জাঁকজমক, উৎসব-আড়ম্বর নির্ভর হিন্দু ধর্মাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ নাগাদ উদ্ভব হয়েছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের। যদিও মনে করা হয় জৈন ধর্মের ইতিহাস আরও প্রাচীন তবে এই ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। যে যাই হোক, ভারতভূমিতে জৈন ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন প্রতিষ্ঠিত না হলেও একটা সময় সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য কায়েম হয়। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। অধিকাংশ বাঙালি আশ্রয় নেন বৌদ্ধধর্মের ছত্র-ছায়ায়। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় আর্যাবত্ত সহ বঙ্গদেশে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তখন নানা মতপথে বিভক্ত হয়ে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরা নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং একটা সময় পুনরায় নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়। বঙ্গদেশে এই পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ে সেন আমলে। উল্লেখ্য, সেন আমলের পূর্বে রাজা শশাঙ্কের শাসনকালে একবার বঙ্গদেশে বৌদ্ধ সমাজের জন্য প্রতিকূল অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি শশাঙ্কের দ্রুত মৃত্যুর কারণে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে বঙ্গদেশ জুড়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজারা তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। অবিচার অত্যাচারের দাবদাহে ঝলসে যায় সামাজিক জীবন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সামনে তখন দুটি পথ খোলা থাকে। এক, পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষা নিয়ে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচানো। দুই, মৃত্যুর হিমশীতল গভীরে নিজেদেরকে সমর্পণ করা। এমন সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে বাংলার মাটিতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ইখতিয়ার উদ্দীন। নতুন করে পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। সেন রাজবংশের পতনের ফলে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের অবসান ঘটে। উচ্চবর্ণ তাদের কর্তৃত্ব হারায়; নিম্নশ্রেণির ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত সমাজ রাজধর্ম তথা ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়ে নতুন করে বাঁচার লক্ষ্যে প্রাণিত হয়। উচ্চ নীচ ভেদাভেদহীন ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তারা খুঁজে পায় তাদের মানসিক বিকাশের পথ। যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়নি তাদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

এতকাল যে উচ্চশ্রেণি অত্যাচারী ছিল এখন তারা নিজেরাই অত্যাচারের শিকার। বড় গাছে স্বভাবত বেশি ঝড় লাগে। তুর্কি শাসনের সূচনায় যে শাসনতান্ত্রিক পালাবদল ঘটছিল তার আঘাতে ধ্বস্ত হচ্ছিল উচ্চবর্ণীয়রা। নিম্নবর্ণীয়দের নতুন করে কিছু হারানোর ছিল না। নতুন শাসনব্যবস্থা ও নতুন ধর্ম পদ্ধতির মধ্যে মুক্তি-পথের সন্ধান পেয়ে তারা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিল। পরিস্থিতির পাঠ নিয়ে প্রমাদ গুণেছিল উচ্চবর্ণীয় সমাজ।

একদিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারানোর যন্ত্রণা, অন্যদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভুত্বের ভিত্তি নড়ে যাওয়া। যে নিম্নশ্রেণির মাথার উপর পা রেখে এতকাল বহাল তবিয়তে চলে যাচ্ছিল সেই নিম্ন শ্রেণিই যদি আর অবশিষ্ট না থাকে, সবাই যদি ইসলামের পতাকাতলে গিয়ে আশ্রয় নেয় তাহলে তো সমূহ সর্বনাশ। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পথে নেমে পড়ে সকলে মিলে। ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে প্রাণপণে। ইসলাম ধর্ম ভালো, কিন্তু হিন্দু ধর্মও নিতান্ত তুচ্ছ নয়; ওদের যেমন কোরান, হাদিস রয়েছে আমাদেরও তেমনি রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, ভাগবত প্রভৃতি। অন্ধ আবেগে ভেসে শুধু শুধু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার কিছু নেই। কে কবে সামান্য কারণে বাপ ঠাকুরদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, এসব কথা বলে তারা লোককে বোঝানোর চেষ্টা করে সম্ভবত। বলাবাহুল্য এত সস্তা কথায় সেদিন চিড়ে ভেজেনি। ধর্মান্তরিত হওয়ার গতিরোধ করতে উচ্চবর্ণীয় প্রভুদের অগ্রসর হতে হয়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত, দিতে হয়েছিল বহুমূল্য। এতকাল যাদেরকে শুধুই ঘৃণার চোখে দেখার রেওয়াজ ছিল এখন তাদের সঙ্গে একাসনে বসে আলাপ আলোচনা করতে হয়, ছেড়ে দিতে হয় অনেকটা জায়গা। বহুকালের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণীয় সমাজ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না উচ্চবর্ণের প্রভুদের। বিশ্বাসের সেতু দৃঢ় করার প্রয়োজন হয়েছিল। সাংস্কৃতিক দেওয়া নেওয়ার মধ্যেদিয়ে উচ্চবর্গ সেকাজে তৎপর হয়েছিল। এককাল যে সমস্ত দেবদেবীরা ছিল শুধুই উচ্চসমাজের, নিম্নশ্রেণির যেখানে কিছুমাত্র অধিকার ছিল না, সেখানে সাধারণের সমানাধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণিতে পূজিত দেবদেবী যাঁরা ছিল উচ্চবর্ণের কাছে শুধুই অবজ্ঞার বিষয় তাদেরকেও আত্মীয় বলে মেনে নেওয়া হল। সামাজিক এই মেলামেশার পথে তখনো যেটুকু প্রতিবন্ধকতা ছিল তার অবসান হল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে এসে। মহাপ্রভুর সমাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা মন্দীভূত হতে হতে একসময় প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে করা হয়, বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এখন যে প্রায় সমান সমান তা কিছুতেই বজায় থাকতো না, যদি চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হত। উচ্চবর্ণের বাইরে সকলেই প্রায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিত।

সেন আমলের অবসানে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার সূত্রে বঙ্গদেশ জুড়ে এই যে পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল তার ঘাত প্রতিঘাতে পলি সঞ্চিত হচ্ছিল বাংলা সাহিত্যের বেলাভূমিতে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক বাহক সেন রাজারা বাংলাদেশের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ছিলেন উন্নাসিক। তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতির কোনোরকম পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। সেন আমলে রাজসভায় বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজ আনুকূল্যধন্য জয়দেব, ধোয়ী প্রমুখ বঙ্গসন্তান কাব্যচর্চা করতে বাধ্য হয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। রাজসভার সীমানার বাইরে নিম্নবর্ণীয় সমাজের আশ্রয়ে কোনোক্রমে প্রবাহিত হচ্ছিল বাংলা ভাষার ধারা। তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার সূত্রে বাংলা ভাষার শৈশবাবস্থার অবসান হল, ধীরে ধীরে যৌবনের দার্ঢ্যতা দেখা গেল এর দেহ মনে। সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিবর্তে দেশীয় ভাষা এবং লোকায়ত সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করার বিষয়ে তুর্কি শাসকরা স্থির প্রতিজ্ঞ হলেন। রাজসভায়

প্রতিষ্ঠা ঘটল বাংলা ভাষার। কৃত্তিবাস, মালাধর থেকে শুরু করে বহুবরেণ্য কবি-ব্যক্তিত্ব সমাদৃত হল রাজরাজড়াদের দ্বারা। একদিকে রাজসভা যেমন দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হল অন্যদিকে তেমনি নানা সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের ঘেরাটোপের বাইরে বার করে এনে ব্যাপকভাবে চর্চা করার প্রয়োজন হল বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের।

ধর্মান্তরমুখী নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সমাজের কাছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ,পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির দুয়ার ছিল চিররুদ্ধ। ধর্মীয় বিধি নিষেধের তর্জনী দেখিয়ে এতদিন নিম্নবর্ণীয়দের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানহীন একটা গোটা সমাজকে রাতারাতি সংস্কৃত শিখিয়ে নিয়ে তাদেরকে রামায়ণ, মহাভারতের পাঠ দেওয়া ছিল একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। সমাজপতিরা তাই বিকল্প পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করার পরিকল্পনা করা হয়। নির্মিত হয় অনুবাদ-অনুসারী সাহিত্যের ভিত্তি। এদিকে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মেলামেশার সূত্রে প্রশস্ত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যের পটভূমি। নিম্নসমাজে পূজিত যেসব দেবতাদের উচ্চবর্ণীয় সমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁদেরকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রক্রিয়া চললো। ভেদাভেদের প্রাচীর ডিঙোতে ডিঙোতে সামাজিক জীবনে যখন বেশ একটা সাম্য অবস্থা তৈরি হল তখন মানসিক বিকাশের দুয়ার গেল খুলে। সে দুয়ার পথে একসময় অবাধ যাতায়াত শুরু হল, বৌদ্ধিক অনুশীলন পৌঁছাল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়। সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় লক্ষ করা গেল এর অভিঘাত। পেটের দায়ে বা পিট বাঁচানোর স্বার্থে রচিত হল মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য; পাশাপাশি পথচলা শুরু হল বৈষ্ণব সাহিত্যের। সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এল নাথসাহিত্য, শাক্তসাহিত্য ইত্যাদি। সবমিলিয়ে পাঁচ শত বছর ধরে চললো বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় অনুশীলন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুগগত প্রয়োজনকে সামনে রেখে হিন্দু সমাজ যখন নতুন করে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা শুরু করে দিয়েছিল মুসলমান সমাজ তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। তারাও তাদের মতো করে পথ চলা শুরু করে। ইতিহাসের এই পর্বে হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার পরিপ্রেক্ষিত এক ছিল না। হিন্দু সমাজ তখন রাজনৈতিক ও সমাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে নিজেদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণে বিশেষ করে যত্নশীল হয়েছিল। মুসলমান সমাজের চিত্রটা ছিল এর বিপরীত। রাজনৈতিক বিপর্যয় নয়, তাদের তখন রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর্ব। সামাজিক জীবন জুড়ে বইছে সুস্বাস্থ্যের মলয় পবন। একদিকে ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ মানসিক উষ্ণতায় তপ্ত, অন্যদিকে আরব বংশোদ্ভূত সমাজ নতুন দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আনন্দে আপ্লুত। ফলত হিন্দু সমাজ যেখানে উঠে পড়ে লেগেছিল সংস্কৃতির সংরক্ষণে মুসলমান সমাজ সেখানে অনুপ্রাণিত হয়েছিল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনার লক্ষ্যে। আরব বংশোদ্ভূত ও ধর্মান্তরিত দুই শ্রেণির পারস্পরিক মেলামেশা ও রক্ত

সংমিশ্রণের ধারাপথে দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল তৃতীয় একটি শ্রেণি। সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে অথবা সুফি সাধক হিসেবে ধর্মপ্রচারের লক্ষ্যে যাঁরা এদেশে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আর স্বদেশে ফিরে যাননি। স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে এখানেই সংসারধর্ম পেতেছিলেন। এদেশের জল হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে উঠেছিলেন এদেশীয়। তাঁদেরই উত্তরসূরীদের দ্বারা গড়ে উঠছিল এই তৃতীয় শ্রেণি। এরা শুধু মিশ্র রক্তের নয় মিশ্র সংস্কৃতিরও ধারক বাহক। আরবীয় ও বাঙালি সংস্কৃতির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটছিল এঁদের জীবন ও মনন জুড়ে। পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হতে অতিক্রান্ত হয়েছিল কয়েক শতাব্দী। কালক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, বিশুদ্ধ আরব বংশোদ্ভূত বাঙালি নগণ্য সংখ্যায় পরিণত হয়। স্বল্প সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট সমাজ রক্তের সংমিশ্রণের ভয়ে নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক স্থাপনে তৎপর হয়েছিল। এতে বংশগতির স্বাভাবিক নিয়মেই তারা দৈহিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হচ্ছিল। একটা সময় এই দুর্বলতা প্রকট রূপ নিয়েছিল। আর সেক্ষেত্রে কেবল রক্তের সম্পর্ক নয়, অন্যান্য আরও অনেক বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃতির উৎসমূল থেকে রস সংগ্রহ করতে না পারলে কোনো জাতি-সংস্কৃতি শেষপর্যন্ত সজীব, সতেজ থাকতে পারে না। এক্ষেত্রেও সেই সমস্যা হয়েছিল। মনে প্রাণে আরবীয় এই সমাজের সঙ্গে একদিকে যেমন দেশীয় সংস্কৃতির কোনো সংযোগ সেতু রচিত হয়নি, অন্যদিকে মূল সংস্কৃতির উৎস থেকে বহুদূরে অবস্থান করায় যোগাযোগের সমস্যা হচ্ছিল। তা ছাড়া আরব সংস্কৃতির যে ঝরনা ধারায় একদা স্নাত হয়েছিল অর্ধেক বিশ্ব তাতে তখন দেখা দিয়েছিল ভাঁটার টান। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে বিশ্ববাসীকে উপহার দেওয়ার মতো তেমন কোনো সম্পদ তখন আর আরবিয়ানদের ঝুলিতে অবশিষ্ট ছিল না। অতীত ঐতিহ্যের অনুধ্যান করতে করতে কেটে যাচ্ছিল তাদের দিন কাল। মূল কাণ্ডই যেখানে শুকিয়ে এসেছিল সেখানে শাখায় প্রশাখায় রসসঞ্চার না হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে এই সমস্যা ছিল না। সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল তৃতীয় শ্রেণি। আরবীয় সংস্কৃতি থেকে যা কিছু রসদ সংগ্রহ করার তা যেমন তারা করতে পারছিল তেমন দেশীয় সংস্কৃতির দ্বারাও তারা প্রভাবিত হতে পারছিল পুরো মাত্রায়।

সে যাই হোক, বাঙালি মুসলমান সমাজ যে আরব মূল ও ধর্মান্তরিত এই দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তার জন্য সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় কোনো সমস্যা হয়নি। তাদের সাহিত্যচর্চার ইচ্ছাশক্তি উৎসারিত হয়েছিল মোটের উপর একই উৎস মূল থেকে। ভাবাবেগের ক্ষেত্রে যা একটু বিভিন্নতা ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ থেকে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল তারা বহুকালাবধি সামাজিক নিপীড়ন সহ্য করার পর এখন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিল। এই অবস্থার মন চাইছিল সৃষ্টির আকাশে পাখা মেলতে। সাধ থাকলেও তাদের তেমন সাধ্য ছিল না। ফলত সাহিত্য সৃষ্টিতে তারা তখনও বিশেষ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছিল না। লোকায়ত সাহিত্যের ঘরানাতেই তারা স্বচ্ছন্দে পাদবিক্ষেপ করছিল। ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা সহ সীমাবদ্ধ কিছু ক্ষেত্রে ফলছিল তার ফসল। এদিকে আরব বংশোদ্ভূতদের রক্তের গভীরে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সাহিত্যবোধ।

আরবি, বিশেষত ফারসি সাহিত্য ততদিন স্পর্শ করেছিল উন্নতির শিখর। এমন সমুন্নত সাহিত্যের উত্তরাধিকারী যে সমাজ তাদের পক্ষে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী না হওয়াই অস্বাভাবিক। সাহিত্যচর্চার জন্য মনে প্রাণে তাগিদ অনুভব করছিল তারা। তবে অনিবার্য কারণে কিছুটা সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। প্রথম কথা, দেশীয় ভাষার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ গড়ে তোলা; দ্বিতীয়ত, দেশীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত পাঠ নেওয়া। এই দুই এর কোনো একটির অভাব থাকলে সাহিত্যচর্চায় সফল হওয়া যায় না। যত দ্রুত সম্ভব এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে সাহিত্যচর্চায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁরা। রচিত হয়েছিল শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'।

আরবি-ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর রোমান্টিক প্রেমকাহিনি। নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসার রূপচিত্রণের পাশাপাশি মানব পুত্র-পরী কন্যা প্রভৃতির প্রেম-কল্পনার সূত্রে আরবীয় কবিরা তাঁদের কাব্যভুবন জুড়ে রোমান্টিকতার যে সৌধ রচনা করেছিলেন তা পরিকল্পনার মৌলিকতায়, সৌন্দর্যের উদ্ভাসনে এমন এক মাত্রা স্পর্শ করেছিল যাকে অনবদ্য বললেও কম বলা হয়। কাব্যরসাস্বাদী মননমাত্র আচ্ছন্ন হয়েছিল এইসব কাব্যের সংস্পর্শে এসে। বাঙালি মুসলমান কবিদের কাব্যকৃতিতেও ঘটে এর অনিবার্য অনুবর্তন। তাঁরা তাঁদের মতো করে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের ঝরনাধারা বইয়ে দেন বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন জুড়ে। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সিরি-ফরহাদ, গোলে-বকাওলী, রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান প্রভৃতি আরবীয় প্রেমকাহিনি বিভিন্ন কবির হাতে নানারূপে, নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়ে পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে তুল্যমূল্য বিচারে সকলকে ছাপিয়ে প্রথম ও প্রধান হয়ে ওঠেন কবি দৌলৎ উজির বাহরাম খান ও তাঁর লায়লী মজনু কাব্যটি। লালমতি সয়ফুলমুলক (আবদুল হাকিম), চন্দ্রাবতী (মাগন ঠাকুর) প্রভৃতি লায়লী মজনুর সমতুল্য না হলেও গুণে মানে এগুলিও নিতান্ত কম যায়নি। সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমালের কাহিনির মধ্যে রয়েছে চমৎকারিত্ব। এখানে মানবপুত্রের সঙ্গে পরী কন্যার প্রেম-ভালোবাসার যে রূপচিত্রণ আছে তা অতি চমৎকার। এই চমৎকার কাহিনি অনন্য নির্মিতি পেয়েছে কবি আলাওল ও দোনা গাজীর প্রতিভার নিবিড়তায়। শমশের আলির রেজওয়ান শাহ উপাখ্যানেও রয়েছে পরি বৃত্তান্ত।

রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান রচনায় আরব জাতি প্রথমাবধি অসামান্য দক্ষ ছিল। তবে ভারতীয়রাও এক্ষেত্রে বিশেষ কম যেত না। রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যের পাশাপাশি ভারতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল কাদম্বরী, মেঘদূত প্রভৃতি অনন্য সব রোমান্টিক উপকরণ সহযোগে। কালক্রমে রোমান্টিক কাব্যপ্রিয় আরবীয় ও ভারতীয় জাতি-সংস্কৃতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটলে খুলে যায় নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। আরব বংশোদ্ভূত ভারতীয় মুসলমান কবি-সাহিত্যিকরা উদ্যোগী হন ভারতীয় রোমান্টিক কাহিনিগুলির সদ্ব্যবহার করতে। শিষ্ট সাহিত্যের পাশাপাশি সেদিন ভারতীয় লোকায়ত সাহিত্য ধারায় প্রচলিত হয়েছিল উৎকৃষ্ট সব প্রণয় কাহিনি। মুসলমান কবিরা তাঁদের সহজাত প্রতিভার দ্বারা এইসব কাহিনিকে লোকায়ত সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বার করে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন বৃহত্তর

কাব্যভুবনে, রচিত হয়—মৈনা কা সাৎ, পদুমাবৎ প্রভৃতি। মৈনা কা সাৎ, পদুমাবৎ এসব কাব্য রচিত হয়েছিল উত্তর ভারত অঞ্চলে হিন্দি-আওয়ধী ভাষায়। এর কারণ ছিল; তখনও পর্যন্ত পূর্ব বা দক্ষিণ ভারতে, আজকের পরিভাষায় হিন্দি বলয়ের বাইরে মুসলমান আধিপত্য সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলত এই অঞ্চলের লোকায়ত জীবনে প্রচলিত কাহিনিগুলির তেমন সদ্‌ব্যবহার শুরু হয়নি। কালক্রমে একটা সময় দক্ষিণ ও পূর্বভারতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেইসূত্রে খুলে যায় রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি চর্চার দ্বিতীয় দুয়ার। বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা একদিকে যেমন হিন্দি-আওয়াধি ভাষায় রচিত প্রেম-কাহিনির বাংলা সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহী হন, অন্যদিকে তেমনি বঙ্গদেশের লোকায়ত জীবনে প্রচলিত কাহিনির সূত্র ধরে নতুন নতুন কাহিনি পরিকল্পনা ও কাব্য রচনায় তৎপর হন। ফলশ্রুতিতে রচিত হয়—লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না (দৌলৎ কাজি), পদ্মাবতী (আলাওল), মধুমালতী (মুহম্মদ কবীর), লালমোতি-সয়ফুলমুলক (আবদুল হাকিম), চন্দ্রাবতী (মাগন ঠাকুর) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশীয় কাহিনি অবলম্বনে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান রচনার এই যে দ্বিতীয় ধারার প্রবর্তন, এর নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মুসলমান রাজন্যবর্গ। তাঁরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা কবিদের উৎসাহিত করেন হিন্দি ভাষার অর্গল মুক্ত করে এইসব কাহিনিকে বাংলা ভাষার অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে। কবি দৌলৎ কাজি লোরচন্দ্রাণী রচনায় প্রাণিত হয়েছিলেন আসরাফ খানের নির্দেশে। পদ্মাবতী সহ আলাওল তাঁর অধিকাংশ কাব্য রচনা করেছিলেন কোনো না কোনো রাজন্যবর্গের নির্দেশে, তাঁর ছত্রছায়ায় থেকে।

লোরচন্দ্রাণী, পদ্মাবতী এসব আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ কাব্য। তবে প্রকৃত বিচারে এগুলিকে অনুবাদ কাব্য না বলে অনুসারী কাব্য বলাই শ্রেয়। ভারতীয় কবিমন ও কাব্যবিষয়ের সরাসরি তর্জমা নেই লোরচন্দ্রাণী, পদ্মাবতী, মধুমালতী প্রভৃতিতে। প্রচলিত কাহিনি কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে কবিরা তাঁদের নিজেদের মতো করে কাহিনিগুলির পরিচর্চা করেছেন। এতে এগুলি কতকাংশে নতুন রূপ লাভ করেছে। লোরচন্দ্রাণী কিংবা মধুমালতী-র কথাই ধরা যাক। এসব কাব্যের ঘটনা বর্ণনায়, চরিত্র চিত্রণে, পরিবেশ রচনায়, ভাষা ব্যবহারে রয়েছে দেশকালের গাঢ় ছায়াপাত। কবি আবদুল হাকিমের লালমোতি সয়ফুলমুলক-এর ক্ষেত্রে এই নিজস্বতার রঙ আরও গভীর ও সর্বাত্মক। একাব্যের কাহিনি মোটের উপর মৌলিক। পূর্বপ্রচলিত কোনো কাব্য-কাহিনির সঙ্গে এর সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। কবি বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্যটিকে যেভাবে নির্মিতি দিয়েছেন তাতে বিষয়টি মৌলিকতায় ভাস্বর হয়েছে। উপাদান চয়নের ক্ষেত্রে কবি বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছেন লোকপ্রচলিত কাহিনি, বিশেষত রূপকথা পশুকথার উপর। এতে একদিকে যেমন কাহিনির মৌলিকতার দাবি দৃঢ় হয়েছে অন্যদিকে তেমনি দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কাব্য কাহিনির যোগ হয়েছে আরও আত্মিক। এখানে কাব্যের একাংশে দেখা যায় লালমোতির সন্ধানে পথচারী সয়ফুল এক অজগর সাপের হাত থেকে কতকগুলি সী মোরোগের ছানাকে রক্ষা করেছে। এতে সী মোরগ দম্পতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে সয়ফুলের প্রতি। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ স্বরূপ তারা সয়ফুলকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে আকাশ পথে। বিরাট সমুদ্র

অতিক্রম করিয়ে তারা তাকে পৌঁছে দিয়েছে লালমোতির পিতৃরাজ্যে। এখানেই শেষ নয়, সী মোরগ দম্পতি তাদের কৃতজ্ঞতার হস্ত আরও প্রসারিত করে সয়ফুলকে জানিয়েছে সে যখনই বিপদে পড়বে তখন যেন তাদের কথা স্মরণ করে। তারা স্মরণ করা মাত্র হাজির হবে এবং তার জন্য যথাসাধ্য করবে। সী মোরগ দম্পতি তাদের কথা রেখেছিল। উপকারীর উপকার স্বীকার করা, প্রতিদান দেওয়া; মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানবসন্তানের এই যে বন্ধুত্ব তা আমাদের লোকায়ত সাহিত্যের পরিচিত মোটিভ। লোকায়ত মোটিভকে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের শরীরে গেঁথে দেওয়ার এই যে প্রবণতা সেই ধারায় সকলকে ছাপিয়ে গেছেন চন্দ্রাবতী কাব্যের রূপকার কোরেশী মাগন ঠাকুর। চন্দ্রাবতী একাধারে শিষ্টসাহিত্য ও রূপকথা।

বাংলা রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান সম্পর্কে একটি কথা বহুল প্রচলিত রয়েছে। এই কাব্যগুলি সুফি ভাবনা জাত; এর দেহমনে রয়েছে সুফি ভাবনার সবিশেষ অভিঘাত। কথাটি অযৌক্তিক নয়। ইউসুফ জোলেখা, লায়লী মজনু প্রভৃতির কাহিনি ধারা ও রচনারীতির অনুপুঙ্খ পাঠ নিলে এখানে সুফি দর্শনের প্রভাব পতিপন্ন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তবে মাত্রাগত ভিন্নতা আছে। চন্দ্রায়ন, পদুমাবৎ প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় কাব্যসমূহে সুফি ভাবনার প্রভাব যত ব্যাপক ও গভীর এখানে তা নয়। সুফি প্রভাব বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারাকে বাইরের দিক থেকে কতকাংশে প্রভাবিত করেছে, গভীরে ছায়াপাত করতে পারেনি। সুফি ভাবনা নিরপেক্ষভাবে কাব্যগুলির কাহিনিধারা ও চরিত্রসমূহের পাঠ নিতে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না। রোমান্টিক কাব্য কাহিনিতে সুফি অনুষঙ্গ ইরানীয় সংস্কৃতির প্রভাবজাত বিষয়। সুফি ভাবনা ঐশ্লামিক সংস্কৃতির এক বিশেষ দিক। অনেকে মনে করেন পবিত্র কোরানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এর সূত্র। আল-কুরআন এ বর্ণিত ইউসুফ-জোলেখা কাহিনি সুফি ভাবনামূলক বলে তাদের ধারণা। সে যাই হোক, সুফি ভাবনা যদি কোরান নির্দেশিত হয় তবে তার পরেও বলার অপেক্ষা রাখে না, এই ভাবনার পরিপুষ্টি ও বিকাশ সাধনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু পারস্য জাতির। আরবদের পারস্য জয় করার আগে সুফি আলাদা করে কোনো ধর্ম-দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। ইরানীয়রা যখন ইসলামের পতাকাতলে এসে আশ্রয় নেয় তখন তারা আল কুরআন নির্দেশিত এই দিকটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করে এবং এর চর্চায় যত্নশীল হয়। মাওলানা রুমি, হাফিজ প্রমুখের কাব্যচর্চার সূত্র ধরে সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা পায় এবং দ্রুত ইসলামি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আরব সংস্কৃতির বেড়া ডিঙিয়ে পারস্য সংস্কৃতি তখন ইসলামি বিশ্বে প্রাধান্য পাচ্ছিল। এই ধারাতেই ভারতীয় রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের ধারায় আছড়ে পড়েছিল সুফিবাদের ঢেউ।

রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের পাশাপাশি সেযুগে মুসলমান কবিরা আর যে যে ধারায় কাব্যের চর্চা করেছিলেন তার মধ্যে অগ্রসর অবস্থানে রয়েছে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামি তত্ত্বকথামূলক রচনা সমূহ। ইসলামের ইতিহাস ধর্মী রচনার আবার দুটি ধারা—জঙ্গনামা বা মর্সীয়া সাহিত্য এবং জীবনী সাহিত্য। বিশুদ্ধ আরব বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা তখন দ্রুত হ্রাস

পাচ্ছে। ধর্মান্তরিত অথবা মিশ্রিত রক্তের ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। এই যে সংখ্যাগুরু শ্রেণি তারা ততদিনে মোটের উপর মনে প্রাণে বাঙালি হয়ে উঠেছে, বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তৈরি হয়েছে তাদের আত্মিক যোগ। এই যোগসূত্রেই তারা ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়। পলিসঞ্চিত হয় বাঙালি মুসলমান অথবা মুসলমান বাঙালি সংস্কৃতির বেলাভূমিতে। বাঙালি মুসলমান সমাজের বাঙালিআনার মূল তখনও খুব সুদৃঢ় নয়। তখনও পর্যন্ত বাঙালি সংস্কৃতির যেটুকু সঞ্চয় ছিল তার অধিকাংশই থেকে গেছিল হিন্দু সমাজের দখলে। মুসলমান সমাজকে নতুন করে সব কিছু অর্জন করতে হচ্ছিল। এই অবস্থায় তারা স্বভাবত দৃষ্টিপাত করেছিল আরবীয় সংস্কৃতির প্রতি। ইসলামের ইতিহাসের নানা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংস্পর্শে প্রাণিত হয়েছিল তারা। বহুকালাবধি সামাজিক অবমাননার মধ্যদিয়ে পথচলার সূত্রে ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ তখনো মানসিক দিক দিয়ে যথেষ্ট দুর্বল অবস্থানে ছিল। এই দুর্বলতা কাটিয়ে তাদেরকে নৈতিক ও মানসিক দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্যবীর্য ও ধর্মপুরুষদের জীবনকথাকে উপজীব্য করা হয়েছিল খুব করে। রচিত হয়েছিল সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ, জয়নুদ্দিনের রসুলবিজয়, বাহরাম খানের ইমামবিজয় প্রভৃতি কাব্য-কবিতা।

নৈতিক ও মানসিক শক্তিতে জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি সেদিনের ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজকে ধর্মশিক্ষার পাঠ দেওয়ার বিশেষ তাগিদ দেখা দিয়েছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজের অধিকাংশই ইসলামের শরিয়তি জ্ঞান সম্পর্কে মোটের উপর অজ্ঞ ছিল। তারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল যেসব সুফি সাধকদের হাত ধরে তাঁরা তাদেরকে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো পাঠ দেননি। ইসলামে আল্লাহ অনুধ্যানের দুটি পথ সেদিন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল—শরিয়ৎ ও মারেফত। কোরান হাদিস নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট পথে একদল আল্লার করুণা লাভের চেষ্টা করছিল অন্যদল বাঁধাধরা কোনো পথে নয়, অন্তরের ঐকান্তিক উপলব্ধির সূত্র ধরে কামনা করেছিল আল্লাহর নৈকট্য। প্রথম শ্রেণির চলার পথের পাথেয় ছিল নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝে সময় করে নিয়ে তারা এইসব কৃত্য সম্পন্ন করত। দ্বিতীয় শ্রেণি নামাজ, রোজার মতো সাময়িক কাজের সূত্র ধরে যেটুকু ঈশ্বর সান্নিধ্য অনুভব করা যায় তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আর কোনো লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিল তারা। তারা তাদের দিনের স্বস্তি, রাতের নিদ্রাকে নিবেদন করেছিল আল্লাহতালার পদতলে; দিনে রাতে আল্লাহর অনুধ্যানে রত থাকত তারা। প্রেমের লক্ষ্যে, ভালোবাসার মালা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করত। বাহ্যিক ধর্মীয় আচার আচরণকে একহিসেবে অস্বীকার করত এরা। এই দ্বিতীয় শ্রেণিকে বলা হয়েছে সুফি সম্প্রদায়। সুফি সম্প্রদায়ের হাত ধরে যারা ইসলামের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা স্বাভাবিক কারণে শরিয়তি পন্থা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেনি। এতে তাদের কোনো সমস্যা তো হয়ইনি, বরং অনেক সুবিধা হয়েছিল। যে দেশীয় ধর্মবোধকে তারা এতদিন ধরে লালন করে আসছিল তার সঙ্গে শরিয়তি ইসলামের ছিল দূরতর ব্যবধান। ইসলাম আল্লাহর একত্ব বিষয়ে কোনোরকম আপোষ করে না। এক

আল্লাহর বাইরে দ্বিতীয় কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব এখানে স্বীকৃত নয়। শুধু আল্লাহর একত্বের প্রশ্নে নয়, আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশিষ্ট যে সংস্কৃতি তার রূপায়ণেও ইসলাম কোনো সমঝোতা করে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুগে হজরত মুহম্মদ(সঃ) তাঁর শিষ্যবর্গদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রাক্ ইসলাম পর্বের যেসব সংস্কৃতি ইসলামের মৌল আর্দশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করতে হবে। সেদিনের ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থান ছিল এর বিপরীত মেরুতে। তারা নীতিগতভাবে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল মাত্র। তার কোনো প্রায়োগিক দিকের প্রকাশ তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে কোনোরকম তাত্ত্বিক জ্ঞান তাদের ছিল না। এই অবস্থায় যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি মতো এই শূন্যস্থান পূরণে যত্নশীল হয়েছিল। এতে ইসলামের একত্ববাদের প্রাচীরে দেখা দিয়েছিল বহু ফাটল। ছোটো বড়ো দেশীয় দেব-দেবীরা কখনো স্বরূপে, কখনোবা ছদ্মবেশে সেই ফাটল পথে দিয়েছিলেন মাথা গলিয়ে। দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তো কোনো কথা ছিল না। ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে ঘোর অসামঞ্জস্যপূর্ণ সব বিষয়ও বাঙালি মুসলমান সমাজে চর্চিত হচ্ছিল সগৌরবে।

তবে একটা সময়ের পর পরিস্থিতিটা আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো না। সুফি সাধকদের প্রভাব ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছিল। পরিবর্তে প্রাধান্য বিস্তার করছিল শরিয়তপন্থীরা। এটা শুধু আমাদের বঙ্গদেশের নিজস্ব বিষয় ছিল না। ইসলামি বিশ্বজুড়ে এই পরিবর্তনের ঢেউ উঠতে শুরু করেছিল। আরব দেশে মাওলানা আব্দুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে যে শুদ্ধিকরণ আন্দোলন শুরু হয় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। মক্কা মদিনার বাইরে ইসলামের প্রচার প্রসার যত বৃদ্ধি পায় ততই ঐশ্লামিক সংস্কৃতি এক বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হয়। আমরা আগেই বলেছি, ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সংস্কৃতির প্রশ্নেও ইসলাম যথেষ্ট রক্ষণশীল। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথ এখানে খুব প্রশস্ত নয়। আল্লার একত্বে বিশ্বাসের পাশাপাশি ঐশ্লামিক সংস্কৃতিকে বরণ করে নিতে দায়বদ্ধ থাকে একজন দীক্ষিত মুসলমান। আর এখানেই দেখা দেয় গুরুতর সমস্যা। ধর্মবিশ্বাস এক অর্থে বাইরের বিষয়। একজন ব্যক্তি চাইলে পোযাক পরিবর্তনের মতো করে ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা হয় না। সংস্কৃতির শিকড় নিহিত থাকে মানুষের রক্তের গভীরে। এর থেকে তাকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ফলত সমস্যা হয়। মুসলিম বিশ্বের কোনায় কোনায় প্রতিটি জাতি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেদিন এই সমস্যা প্রকট হয়েছিল। টানাপোড়েন চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। শেষপর্যন্ত ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল এক নতুন সংস্কৃতি। দেশে দেশে ইসলাম লাভ করেছিল নানা রূপ। এতে বিশুদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতির শরীরে লক্ষ করা যাচ্ছিল নানা দাগ। এই দাগ ধুয়ে ফেলে ইসলামকে এর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, কেবল কোরান, হাদিস এর নির্দেশকে সামনে রেখে আন্দোলন শুরু করেছিলেন মাওলানা ওয়াহাব। ওয়াহাবি আন্দোলন নামে খ্যাত এই আন্দোলনের অভিঘাত লক্ষ করা গেছিল আমাদের বঙ্গদেশেও।

ওয়াহাবি আন্দোলন অবশ্যই একটা প্রাতিষ্ঠানিক নাম; এই আন্দোলনের অনানুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল এরও অনেক আগে থেকে; প্রধান চার খলিফার যুগ শেষ হওয়ার পরে পরেই। চার খলিফার সময় পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাকে একাত্ম করে দেখা হত। ইসলামি বিশ্ব পরিচালিত হত এক রাজদণ্ডের অধীনে; ঐশ্লামিক বিধি বিধানকেই সেখানে শেষকথা বলে মনে করা হত। চার খলিফার যুগ শেষ হওয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের খলিফারা কেবল রাজদণ্ড হাতে নিয়ে শাসনকার্যে মনোনিবেশ করেন; ইসলামের প্রচার প্রসার বা ঐশ্লামিক আদর্শের প্রতিষ্ঠাকে তাঁরা তখন আর তাঁদের অদ্বিতীয় লক্ষ্যের সীমানায় রাখেন না। এতে ইসলামি বিশ্বের সীমা প্রসারিত হয় মাত্র, ইসলাম ধর্ম ও ঐশ্লামিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় ভাঁটার টান শুরু হয়। একদিকে সুফি সাধকদের অমোঘ প্রভাব, অন্যদিকে রাজশক্তির ঔদাসীন্য সবমিলিয়ে অন-ইসলামিক সংস্কৃতির বাড় বাড়ন্তের দিনে শরিয়তপন্থীরা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। তারা তাঁদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা মতো এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ, অন্য অর্থে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। বঙ্গদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই প্রতিরোধ প্রবণতার সূত্রধরে সূত্রপাত হয়েছিল ইসলামি তত্ত্বকথাধর্মী রচনার। শরিয়তপন্থী কবিরা দেশীয় মুসলমানদেরই ঐশ্লামিক সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ পাঠ দেওয়ার লক্ষ্যে রচনা করেছিলেন রাহাতুলকুলুব, দূররে মজলিশ, কিফায়তুল মুসললিন প্রভৃতি। কোরান, হাদিস নির্দেশিত ধমাদর্শ ও জীবনাচারকে লোকবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছিল এখানে। সেদিক থেকে বাংলা অনুবাদ কাব্যগুলির সঙ্গে এই ইসলামি তত্ত্বকথা নির্ভর কাব্যের যোগসূত্র রয়েছে।

শরিয়তপন্থীরা যতই প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলার চেষ্টা করুক না কেন তারা যে খুব সফল হয়েছিল এমন নয়। নির্দিষ্ট একটা শ্রেণির বাইরে তারা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। পির দরেবেশদের প্রভাব ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা সামাজিক অভিঘাত। সবমিলিয়ে সাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তার ধারা বহমান ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। উত্তর পলাশির যুদ্ধ পর্বে মুসলমান সমাজের ভাগ্য বিপর্যয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাম্প্রদায়িক নীতি, হিন্দু জাতীয়তাবাদের জাগরণ, মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের জাগরণ প্রভৃতির প্রেক্ষিতে সেদিন যে সামাজিক অবস্থা তৈরি হয়েছিল তা কঠিন থেকে কঠিনতর রূপ নিতে নিতে আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার আগুন বেড়েই চলেছে। প্রাক্ পলাশির যুদ্ধপর্বে পরিস্থিতিটা মোটেই এইরকম ছিল না। রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাবর্গের সংঘাত হয়েছে; সে সংঘাতের পরিণতিতে বাঙালি হিন্দু সমাজ তুলনায় হয়তো একটু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুসলমান প্রজারা রাজশক্তির অত্যাচারে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমনটা অবশ্যই নয়। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘাত হয়েছে, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটেছে এমন নিদর্শন প্রায় নেই। আসলে সেদিনের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজ এমন এক

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করছিল যে জাতি বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা এসব বিষয় প্রশ্রয় পাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। আমরা আগেই বলেছি, ভারতের মাটিতে যখন ইসলামের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন শাসক মুসলমানদের মধ্যে আদর্শগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। তারা তখন শুধুই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসী। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার কোনো নৈতিক দায় তারা স্বীকার করেননি। কোনো দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তিকে দৃঢ়মূল ও দীর্ঘস্থায়ী করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কৌশল বিজিত জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের উপর কোনোরকম হস্তক্ষেপ না করা। ভারতবর্ষীয় মুসলমান শাসকরা এই নীতিকে যথাসম্ভব মান্যতা দিয়েছিলেন। তাঁরা একদিকে যেমন এদেশের মানুষকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কোনোরকম উৎসাহ দেখাননি, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মাচারের পথে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেননি। হিন্দু সমাজে নরবলি থেকে শুরু করে যাবতীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল মুসলমান যুগে। রাজ-অমাত্য বা উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের কেউ কেউ বিষয়টিকে বাঁকা নজরে দেখলেও রাজার দিক থেকে প্রশ্রয় না পাওয়ায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ফলত হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের কোনোরকম ফাটল ধরেনি। উল্লেখ্য, এইসময় ঔরঙ্গজেবের মতো কোনো কোনো মুঘল সম্রাট সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য কমবেশি প্রয়াসী হয়েছিলেন মাত্র। রাজশক্তির আনুকূল্যের পাশাপাশি অন্য আরও সব অনুষঙ্গও এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হয়েছিল পির-ফকিরদের হাত ধরে। সুফি সাধকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণায় গড়ে উঠেছিল সেদিনের যে মুসলমান সমাজ ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেশীয় হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের তেমন কোনো বৌদ্ধিক ব্যবধান তৈরি হয়নি। ফলত সংস্কৃতি সমন্বয়জাত কাব্যের পটভূমি প্রস্তুত হয়েছিল উত্তম রূপে।

কোনো সন্দেহ নেই বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ধর্মীয় জীবনে কমবেশি ভিন্নাচারী হলেও বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রায় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাঁদের সে ক্রিয়াশীলতার সূত্র ধরে গড়ে উঠেছিল সম্প্রদায় নিরপেক্ষ এক জাতি সংস্কৃতির ভিত্তি। আর এই সংস্কৃতির মূল থেকে উৎসারিত হয়েছিল সংস্কৃতি সমন্বয়জাত কাব্যসমূহ; মুহম্মদ খানের সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ যুগ সম্বাদ, গরীবুল্লাহর সত্যপীরের পাঁচালী ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার, সংস্কৃতি সমন্বয়জাত কাব্যের ধারায় এমনিতে মুসলমান কবিদের একাধিপত্য। হিন্দু কবিরা এই ধারার কাব্যরচনায় তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি এবং তারও উপযুক্ত কারণ রয়েছে। শুধু সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নয়, যেকোনো সামাজিক বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিতে সমন্বয় ও সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয় অগ্রসর শ্রেণিকে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণি অনিবার্য কারণে এক্ষেত্রে আগ বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে পারে না। গরিব লোকে চাইলেও ধনী লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের গাঁটছড়া বাঁধতে পারে না। অন্যদিকে ধনীদের পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। একটু আন্তরিকভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিলেই হল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন মুসলমান সমাজ ছিল

অগ্রসর অবস্থানে। ফলত তারা এই সম্প্রীতির বন্ধন রচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ইউসুফ জোলেখা থেকে শুরু করে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের দ্বারা রচিত অধিকাংশ কাব্যই উচ্চকিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুরে। এমনকি নূরনামা, দূররে মজলিশ প্রভৃতির মতো ধর্মীয় বিষয়াশ্রিত রচনা সমূহও। এসব রচনার নিবিড় পাঠ নিলে দেখা যাবে, কাহিনির অন্তরঙ্গ রূপায়ণ থেকে ভাষা ব্যবহার সর্বত্র সাম্প্রদায়িক, সম্প্রীতির ছাপ সুস্পষ্ট।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের কাব্যকৃতির অন্যতম প্রধান একটি অধ্যায় হল পুথিসাহিত্য বা মিশ্রভাষারীতির কাব্য। নামকরণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আপাতত ওই বিতর্ককে দূরে সরিয়ে রেখে অন্য প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। কাকে বলা হয় পুথিসাহিত্য। অন্য কাব্য ধারার সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়। কবে থেকে কোন প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছিল পুথিসাহিত্যের পথ চলা। এমন অনেক প্রশ্ন দানা বাঁধে প্রসঙ্গত। এইসব জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আমরা প্রথমেই বলবো, প্রগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের কৃত পুথিসাহিত্য সম্পূর্ণ মৌলিক কোনো বিষয় নয়। তবে অপরাপর কাব্য-কবিতার সাপেক্ষে অবশ্যই এর একটা নিজস্বতা রয়েছে। এই নিজস্বতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে কবিদের জীবনবোধ ও ব্যবহৃত ভাষারীতির সাপেক্ষে। অন্যান্য কাব্য-কবিতার সঙ্গে পুথিসাহিত্য ধর্মী রচনার তুলনামূলক পাঠ নিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় জীবনের উত্তাপ, জীবনবাস্তবতার গভীরতা এখানে তুলনামূলকভাবে কম। অলৌকিকতা, অতিলৌকিকতা, রোমান্স রস প্রভৃতির প্রাধান্য রয়েছে এখানে। ভাষারীতির দিক থেকে পুথিসাহিত্য একটু অন্য রকমের। এখানে ব্যবহৃত শব্দ সমূহ অবিমিশ্র বাংলা নয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দের পাশাপাশি যথেষ্ট পরিমাণে আরবি ফারসি মূল সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এই কাব্য ধারায়। সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক মিশ্র ভাষারীতি। পুথি সাহিত্যের অন্য একটি নিজস্বতার দিকও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এখানে কাব্যের আশ্রিত বিষয় সবই প্রায় আরবীয় ঐতিহ্য প্রসূত; দেশীয় বিষয়ের অনুবর্তন প্রায় নেই। এখন প্রশ্ন, কেন এই মিশ্র ভাষার ব্যবহার, কেনই বা জীবন বিমুখতা, দেশীয় সংস্কৃতির মূল থেকে বিচ্যুত হওয়া।

পুথিসাহিত্যে ব্যবহৃত মিশ্র ভাষারীতি আকস্মিক বা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। সমাজবাস্তবতার উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়েছে এই ভাষা। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে ফারসি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল রাজভাষার আসনে। তবে একটা সময় পর্যন্ত বিষয়টি জনজীবনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। অবস্থার পরিবর্তন হয় তুর্কি শাসনের অবসানে বাংলায় মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে। ইতিপূর্বে ইলিয়াসশাহি, হোসেন শাহি সহ অপারপর যেসব রাজবংশ বাংলাদেশ শাসন করতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। এদেশে বাস করতে করতে এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে অনেকটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা তৈরি হয়েছিল তাঁদের। ফলত দেশীয় ভাষা সংস্কৃতির সংরক্ষণে ও পৃষ্ঠপোষকতায় যত্নশীল হয়েছিলেন তাঁরা। ইলিয়াস শাহ ও হোসেন শাহের বাংলা ভাষা

প্রীতি তো প্রবাদপ্রতীম বিষয়।পরিস্থিতির পরিবর্তন হল সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর। এখন থেকে বাংলার শাসন কর্তারা আর স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস করছিলেন না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্বভার নিয়ে তাঁরা এখানে আসছিলেন এবং দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফিরে যাচ্ছিলেন দিল্লিতে। এই অবস্থায় দেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের কোনো অন্তরঙ্গতা তৈরি হচ্ছিল না। ভাষিক ক্ষেত্রে পড়ছিল এর মারাত্মক প্রভাব। রাজদরবারে ফারসি ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল; ক্রমশ পিছনের পায়ে চলতে চলতে একসময় অপাংক্তেয় প্রায় হয়ে পড়ছিল বাংলা ভাষা। তারপর একসময় জীবন-জীবিকার স্বার্থে ফারসি ভাষার ব্যবহারে রপ্ত হয়ে পড়েছিল অগ্রসর সমাজ। সমাজভাষায় পড়ছিল এর অনিবার্য অভিঘাত। বাংলা শব্দভাণ্ডারে ভিড় করে আসছিল আরবি-ফারসি শব্দ। তৈরি হয়েছিল মিশ্র ভাষিক সংস্কৃতি। বর্তমানে ইংরেজি বাংলার সংমিশ্রণের ফলে যেমন হচ্ছে। একটা সময় সমাজজীবনে চর্চিত এই মিশ্রভাষা জায়গা করে নিয়েছিল লেখার ভাষায় এবং তারও পরে সাহিত্য ক্ষেত্রে। ভারতচন্দ্র কথিত 'যাবনী মিশাল' ভাষা-বৃত্তান্তে ধরা রয়েছে সে ইতিহাস। দিন যত অগ্রসর হচ্ছিল বাংলা শব্দভাণ্ডারে ততই বেশি বেশি করে জায়গা করে নিচ্ছিল আরবি ফারসি শব্দ। সবমিলিয়ে দৃঢ়মূল হয়েছিল মিশ্রভাষা। কবি সাহিত্যিকরা কলম হাতে লিখতে বসে অতিক্রম করতে পারেননি এই ভাষার অভিঘাত। তাঁরা মিশ্রভাষারীতিকেই বিশেষ করে শিরোধার্য করেছিলেন। মিশ্রভাষারীতি নির্ভর সেদিনের এই যে বাংলা সাহিত্য তাকেই বলা হয়েছে পুথিসাহিত্য।

কেন এই নামকরণ, নামকরণটি সুপ্রযুক্ত কি না এসব বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এমনিতে পুথি সাহিত্যের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পুথি বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি হাতে তৈরি পত্রে হাতের লেখায় লিখিত সাহিত্য। এই পুথির সঙ্গে তথাকথিত পুথিসাহিত্যের সেই অর্থে কোনো যোগ নেই। প্রথমত পুথিসাহিত্য হাতে লেখা নয়, মুদ্রিত কাব্য; দ্বিতীয়ত এখানে হাতে তৈরি কোনো পত্র ব্যবহার করা হয় না, মেশিনে তৈরি কাগজ ব্যবহৃত হয়। এত বৈপরীত্য সত্ত্বেও একে পুথিসাহিত্য বলা হয় সম্ভবত উপযুক্ত কোনো নামের অভাবে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্য, দোভাষী সাহিত্য ইত্যাদি নানা নামে নামাঙ্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই সাহিত্য ধারাকে। কিন্তু কোনো নামই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি। এক একজন এক একটি নামকে গ্রহণ করেছেন। আমরা এক্ষেত্রে পুথিসাহিত্য নামটিই অপেক্ষাকৃত সুপ্রযুক্ত বলে মনে করছি। পুথি সাধারণত একজন পাঠক পাঠ করে এবং শ্রোতারা পাঠকের চারিদিকে গোল হয়ে বসে সে পাঠ শোনে; আনন্দ আস্বাদ করে। বিষয়টির সঙ্গে মিশে আছে তথাকথিত পুথির ধারণা। এক্ষেত্রেও একজন পাঠক পুথিটি পাঠ করে এবং অন্যেরা বসে বসে শোনে। পুথিসাহিত্যের পাঠক মুখ্যত গ্রাম্য মুসলমান সমাজ। এরা সাধারণত এক একটি পুথিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। পুথিপাঠ শেষ হলে সুন্দর কাপড়ে মুড়ে পুথিটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়; কোরান বা হাদিসের মতো করে। সেদিক থেকে এমন নামকরণের বেশ একটা তাৎপর্য রয়েছে। তুলনায় মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বা দোভাষী সাহিত্য এই নামকরণের ভিত্তি দুর্বল। প্রথমত, ভাষাবিজ্ঞানের

নিজস্ব দৃষ্টিকোণ অনুসারে, পুথিসাহিত্যের ভাষা মিশ্রভাষার দৃষ্টান্ত নয়। মিশ্রভাষা তৈরি হয় দুটি পৃথক ভাষার সামগ্রিক সংমিশ্রণের ফলে। শব্দের সংমিশ্রণ এখানে শেষকথা নয়। দ্বিতীয়ত পুথিসাহিত্যের ভাষায় যেহেতু বাংলা, আরবি, ফারসি প্রভৃতি তিন বা ততোধিক ভাষার সংমিশ্রণ রয়েছে কাজেই দোভাষী বিশেষণও এক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত নয়। সমস্যা রয়েছে অন্যদিক থেকেও। ভাষারীতি পুথিসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই, কিন্তু একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ভাষারীতির বাইরেও এই কাব্যধারার অন্য অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তুলনায় কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, এই কাব্যধারায় প্রতিবিম্বিত সমাজ মানসের দিকটি। অপরাপর কাব্যশাখার তুলনায় পুথিসাহিত্যে যে সমাজবীক্ষার পরিচয় রয়েছে তা দৃশ্যত বিভিন্ন। পুথিসাহিত্য বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সমাজের সৃষ্টি এবং মুসলমান সমাজ কর্তৃক প্রণীত অন্য কাব্যের সঙ্গে এর স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই অস্বীকার করার নয়। পুথিসাহিত্যের বাইরে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের কাব্যকৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা। সগীর থেকে আলাওল প্রত্যেক কবি এই পথে পা রেখেছেন। পুথিসাহিত্য সে দিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। এখানে কমবেশি সাম্প্রদায়িক উচ্চারণ রয়েছে। সগীর থেকে আলাওল, পুথিসাহিত্যের বাইরে অন্যত্র মুসলমান কবিদের রচনায় জীবন বিমুখতার কোনো পরিচয় নেই। জীবনকে নানারঙে রঞ্জিত করে পরিবেশন করা হয়েছে এইসব কাব্যে। এদিকে পুথিসাহিত্যে জীবনবিমুখতাই শেষকথা। এখানে প্রত্যক্ষ জীবন বাস্তবতার উত্তাপ প্রায় নেই। এর সবই অতীত আশ্রিত বিষয়; সম্পূর্ণটাই কল্পনার পাখায় ভর করে ভেলা ভাসানো। বহমান জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো বাস্তবসম্মত প্রতিবিধানের প্রবণতা পুথিকারদের মধ্যে একেবারেই প্রাধান্য পায়নি। মুসলমান জাতির অতীতের গৌরব কথা বর্ণনা করে সস্তায় বাজিমাৎ করতে চেয়েছেন তাঁরা। বলাবাহুল্য এই পথে হতাশাগ্রস্ত জনমনে ক্ষণিকের জন্য প্রাণের উত্তাপ সঞ্চার করা যায়, রাঙিয়ে দেওয়া যায় জীবনের রঙে; কিন্তু বক্ষ্যমাণ সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান করা যায় না। পুথি সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এখন বিচার্য, কেন এই জীবনবিমুখতা, কেন এমন সাম্প্রদায়িক উচ্চারণ। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো দুটি বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই আকস্মিক বা কার্যকারণ সম্পর্ক নিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়। সেদিনের সমাজ ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা বিষয়গুলিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। পুথি সাহিত্যের যখন যাত্রা শুরু হচ্ছে তখন অস্ত গেছে বাঙালি মুসলমানের সৌভাগ্য সূর্য। রাজার জাত থেকে প্রজাতে পরিণত হয়েছে তারা। এখানেই শেষ নয়। এতকাল যারা ছিল প্রজার জাত আজ তারা রাজা না হলেও রাজার প্রিয়পাত্র। রাজানুগত্যের সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা এখন তাদের ভূতপূর্ব প্রভুদের উপর চোখ রাঙাচ্ছে। বিষয়টা মুসলমানদের কাছে মোটেই উপাদেয় ছিল না। গোদের উপর বিষ ফোড়া হয়ে উঠেছিল সেদিনের ইংরেজ প্রভুদের গৃহীত কতকগুলি সিদ্ধান্ত। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কলকাতায়। মুর্শিদাবাদে যে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল কলকাতায় এসে তারা হয়ে গেল একেবারে ফালতু লোক; কোনোরকম প্রতিপত্তিই আর তাদের বজায়

রইল না। শহর কলকাতায় সেদিন প্রতিপত্তি অর্জনের উপায় হিসাবে যেসব পথ খোলা ছিল তার কোনোটাই মুসলমানদের জন্য সুগম ছিল না। ভূতপূর্ব রাজভাষা ফারসিকে বিসর্জন দিয়ে রাতারাতি ইংরেজি ভাষার আনুগত্য করা বাস্তব কারণেই মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না; অনুরূপভাবেই অস্বাভাবিক ছিল সেদিনের হঠাৎ প্রভু হয়ে ওঠা ইংরেজদের তাঁবেদারি করা। ফলত স্রোতের প্রতিকূলে হাঁটতে হচ্ছিল তাদের। এতে প্রতিবেশি হিন্দু সমাজের থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল তারা। প্রতিবিধানের কোনো সম্ভাবনাই তখনো পর্যন্ত পরিস্ফুট হচ্ছিল না। এমন নেতিবাচকতার মধ্যেও যেটুকু নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেল রাজশক্তির নতুন ভূমিরাজস্ব নীতির প্রভাবে। লাখেরাজ সম্পত্তি বিলোপন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতির প্রভাবে এককথায় মুসলমান সমাজের মাজা ভেঙে গেছিল। হতাশার গভীর অন্ধকারে দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছিল তারা; অপসৃত হচ্ছিল এতকালের লালিত মূল্যবোধ। যে হিন্দু সমাজের সঙ্গে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা হয়েছিল আজ সহসা তার ডালি উল্টে দেওয়া হল। প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার জাগরণ ঘটল চূড়ান্ত রূপে। পুথিসাহিত্যের অঙ্গনে চলল সাম্প্রদায়িকতার চর্চা। বাস্তবে যে হিন্দু সমাজের টিকিটি পর্যন্ত স্পর্শ করা যাচ্ছে না সাহিত্যের আসরে সেই হিন্দু সমাজকে সুবিধা মত অপদস্থ করা হল। গরীবুল্লাহর সোনাভানে যেমন। প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু কন্যা সোনাভানকে এখানে শেষাবধি আবু হানিফার বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে।

পুথিসাহিত্যের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এর সূচনা হয়েছিল এবং গোটা উনিশ শতক জুড়ে চলেছিল তার বিপুল প্রবাহ। বিংশ শতাব্দীতেও বহমান ছিল এর ধারা এবং একবিংশ শতাব্দীতেও রয়ে গেছে তার অবশেষ। কমবেশি আড়াইশো বছরের এই যে পুথিসাহিত্য, তার সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার চর্চা হয়েছে এমন নয়। মাত্রাগত বিভিন্নতা অবশ্যই রয়েছে। গরীবুল্লাহ প্রমুখের রচনায় যে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ আছে সেখানে ভেদবুদ্ধিই শেষকথা নয়। সাম্প্রদায়িকতার পর্দা সরিয়ে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার উচ্চকৃত উচ্চারণ ঘটেছে জায়গায় জায়গায়। এমনকি সোনাভানেও রয়েছে তার নিদর্শন। এখানে সোনাভানের হাতে পরপর তিনবার পর্যুদস্ত হয়েছে আবু হানিফা। একজন বেদীন নারীর কাছে মুসলিম জগতের পৌরুষত্বের অন্যতম প্রতিমূর্তির এমন নিদারুণ পরাজয় মুসলিম ভাবাবেগের পক্ষে একেবারেই ইতিবাচক নয়। তবু কবি অবলীলায় সে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। এ তাঁর চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িক মননের পরিচয়।পরের দিকের পুথিসাহিত্যে এই অসাম্প্রদায়িক মুখটি ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের দিন শেষ হয়ে তখন গোটা বঙ্গদেশ জুড়ে হিন্দুত্ববাদের জোয়ার বইছে। সে জোয়ারের প্রাবল্যে ভেসে যাচ্ছে সবকিছু; মানুষের মূল্যবোধও। এইসময় তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যুক্তিবাদী মানুষও কলম হাতে সাম্প্রদায়িকতার চাষ চষতে দ্বিধা করেননি। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখাযায় পুথিসাহিত্যে। পুথিসাহিত্যের দিগন্ত জুড়ে তখন শুধুই সাম্পদায়িকতার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। মিথ্যা হয়ে গেছে মধ্যপন্থার ধারণা।

পুথিসাহিত্যে প্রয়োজনমতো সাম্প্রদায়িকাতর চাষ চষার পরেও মুসলমান সমাজের দিক থেকে সমস্যার কিন্তু বিশেষ কোনো সমাধান হয়নি। অন্যকে অপমানিত বা হীনভাবে চিত্রিত করে মনের জ্বালা কিছুটা মেটান যায় বটে কিন্তু তাতে পেটের ক্ষুধার বিশেষ সমাধান হয় না। মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রেও তাই হল। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিপন্ন অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। ফলস্বরূপ হতাশার কুয়াশা আরও জমাট রূপ নিল। এই অবস্থায় সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে নতুন কোনো বোধের উদ্ভাসন সম্ভব নয়। স্বাভাবিক নয় বাস্তবতার পীড়নকে বুক পেতে গ্রহণ করা, তা সে যতই সত্য হোক। কোনো সন্দেহ নেই, বাস্তবের পীড়ন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল বলেই মুসলমান সমাজ বাস্তবের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; মেতে উঠেছিল অতীত ইতিহাসের চর্চায়, রোমান্টিকতার স্রোতে ভেসে যেতে। পুথিসাহিত্যকাররা ধারণ করেছিল এই সমাজ সত্যকে। যদি মোটাদাগের সমীকরণ করা হয় তবে স্বীকার করতেই হয়, মুসলমানিত্বের চর্চাই ছিল পুথিসাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কথা। মুসলমানিত্বের রঙকে আরও গাঢ় করে লেপে দেওয়ার জন্যই প্রায়শ পুথিসাহিত্য ডানদিক থেকে বামদিকে সজ্জিত হতো। অর্থাৎ শেষের দিক থেকে শুরু হত এগুলি।

রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান, ইসলামি সাহিত্য, যুদ্ধকাব্য, সংস্কৃতি সমন্বয়জাত কাব্য, পুথিসাহিত্য এসব মিলিয়ে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন বিশেষ রূপে অলঙ্কৃত হয়েছিল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারা। অভিনবত্ব, বৈচিত্র্য, শৈল্পিক উৎকর্ষতা সবদিক থেকেই এইসময়ের মুসলিম কবিরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন অনন্য ভূমিকায়। হিন্দু কবিদের ধর্মীয় ভাবাদর্শের বাঁধনে আবদ্ধ বাংলাসাহিত্যের পথচলা সেদিন বহুলাংশে বিঘ্নিত হত মুসলিম কবিদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ব্যতিরেকে। বলা যায়, বাংলাসাহিত্যের মানসমুক্তি ঘটিয়ে একে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে এনে হাজির করেছিলেন তাঁরাই। এদিকে প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বইগুলিতে তাঁদের সে অসামান্য অবদানের কথা উপেক্ষিত থেকে গেছে, অন্যঅর্থে অস্বীকৃত হয়েছে। বিষয়টি গৌরবের না নিন্দার তার বিচারের ভার সুধীজনদের উপর ন্যস্ত করা শ্রেয়। আমরা আপাতত আমাদের কথা শেষ করতে পারি আরও দুই একটি কথা বলে।

মুসলিম কবিদের দ্বারা রচিত সব কাব্য-কবিতা অবশ্যই সম গুণমাণের নয়। তবে অধিকাংশ সৃষ্টিরই কমবেশি একটা নিজস্বতা রয়েছে, যা মোটের উপর গৌরবের । তবে এই গৌরবের শরীরেও মিশে গেছে বেশ একটু অগৌরবের রঙ। মুসলিম কবিদের দ্বারা রচিত সাহিত্যে অনেক কিছু আছে, কিন্তু একটা জিনিস প্রায় নেই এবং তা হল বাঙালি মুসলমান সমাজের রূপায়ণ। ইউসুফ জোলেখা, লায়লী মজনু, রাহাতুল কুলুব, জঙ্গনামা প্রভৃতির অনুপুঙ্খ পাঠ নিয়েও আমরা জানতে পারি না যে, যে সমাজে এইসব কাব্য পঠিত ও চর্চিত হত সেই সমাজের কোনো অন্তরঙ্গ পরিচয়; বাঙালি মুসলিম সমাজ কী খেত, কী পরতো, কেমন ছিল তাদের পারিবারিক জীবন ইত্যাদি। মুসলিম কবিদের কাব্যকৃতির এ এক বিরাট দুর্বলতার দিক। কেন এই দুর্বলতা তা নিয়ে অনেক কথা হতে পারে; তবে সেসব হাজারও কথার জাল বিছিয়েও সম্ভবত এর এই দুর্বলতাকে আড়াল করা যাবে না।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য—ড. মুহম্মদ এনামূল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
২। ইসলামি বাংলা সাহিত্য—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৩। ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি—ওসমান গনি, রত্নাবলী, কলকাতা
৪। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান—দীনেশচন্দ্র সেন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, দে’জ, কলকাতা
৬। বাংলা রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান—ওয়াকিল আহমেদ, খান ব্রাদার্স, ঢাকা
৭। বাংলা রোমান্টিক কাব্যে আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি—মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৮। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—মনসুরউদ্দীন, রতন পাবলিশার্স, ঢাকা
৯। বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ চরিত—মুহম্মদ মজীরুদ্দিন মিঞা, রাজশাহী
১০। বাংলা সাহিত্যে রসুল চরিত—মুহম্মদ মজীরুদ্দিন মিঞা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা
১২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা
১৩। বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য—গোলাম সাকলায়েন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৪। বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১-২), আহমদ শরীফ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
১৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৪)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
১৬। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থ ভূমিকা (১-২)—আহমদ শরীফ, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা
১৭। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবি—আজহার ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক—মুসা কলিম, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা
১৯। ‘মুসলমানী’ পুঁথি সাহিত্য—আব্দুল খায়ের সেখ, বুকস স্পেস, কলকাতা
২০। মুসলিম বাংলা সাহিত্য—এনামুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
২১। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য—আনিসুজ্জামান, প্রতিভাস, কলকাতা
২২। মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক—গোলাম সাকলায়েন, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা